OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 332
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 323 - 332
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকের অবক্ষয়িত সমাজের দলিল : প্রসঙ্গ ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ও ‘বাবাজী’

ড. তাপস কয়াল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শম্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর
Email ID : tapaskayal87@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
19th century, faults, anomalies, social customs, child marriage, English-educated youth, decaden, depraved, comparative thought.

Abstract
From the second half of the 19th century, the dramas written in Indian languages were mainly social-centered and focused on the multifaceted problems of society. Ranging from the various faults and anomalies of social customs, child marriage and the slippage of the upper castes, as the playwrights have eloquently depicted, the trend of drunkenness among the English-educated youth of the time has landed as an important social problem. This problem is mainly seen in early plays or farces. For example, Madhusudan Dutt's 'Ekei ke bale sabhyta' in Bengali, Assamese Hem Barua's 'Kaniar Kirtan' in Assamese, Madgaonkar's 'Bhojanbandhu Pantangwakhu' in Marathi, 'Babaji' in Oriya, etc. plays and farces can be specially mentioned. The immediate purpose of this essay is to shed light on how decadent and depraved the new English-educated Babu society and in society the drinking habit of zamindar class have become in the plays 'Ekei Ki Bale Sabhyta' (1860) by Madhusudan Dutta and 'Babaji' (1877) by Jagmohan Lala. In this comparative thought, not only the similarity but also the contrast is the history of the ups and downs of the society.

Discussion

বিলাতিয়ানায় স্টেজ ও অভিনয় দেখে ভারতীয় ভাষার লেখকেরা নাটক লেখায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় রঙ্গমঞ্চ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। যা সম্পূর্ণ অনুসরণ এবং অনুবাদের পন্থাবলম্বনে বহুদিন ধরে সভ্যতা সময়ের এক-একটি সোপান অতিক্রান্ত হয়েছে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটককে কেন্দ্র করে। অনুসরণ এবং অনুবাদের হাত ধরে তৎকালীন সময়ে কোনো মৌলিক নাটক রচনার তথ্য-প্রমাণ সেভাবে পাওয়া যায় না। তবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যোগেশ চন্দ্র গুপ্তের ‘কীর্তিবিলাস’ (১৮৫২) এবং শ্রীতারাচরণ শিকদারের (১৭৭৪ শকাব্দ) ‘ভদ্রার্জুন’ (১৮৫২) নাটক দুটি মৌলিক নাটক রচনার দাবিদার বলা যায়। তবে ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সার্থক সামাজিক মৌলিক নাটক রচনায় প্রধান প্রথম দাবি রাখে রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুল সর্বস্ব’ (১৮৫৪) নাটকটি। সমালোচকদের মতে রামনারায়ন তর্করত্ন ‘কুলীনকুল সর্বস্ব’

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 332
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ে প্রহসন রচনার একটা বিশেষ পথ নির্দেশ করেছিলেন। এছাড়া তিনি ‘যেমন কর্ম তেমনি ফল’, ‘চক্ষুদান’, ‘উভয় সংকট’, প্রভৃতি প্রহসন রচনা করেন। সেই পথের অন্যতম পথিকৃত নাট্যকার মধুসূদন দত্ত। তাঁর ‘একেই কি বলে সভ্যতা’(১৮৬০) ও ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রোঁ’ (১৮৬০) প্রহসন দুটি। এ প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের ‘সধবার একাদশী’ (১৮৬৬), ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’, (১৮৬৬) ইত্যাদি নাটকও উল্লেখযোগ্য।

শুধুই বাংলা ভাষায় নয়, বাংলা সামাজিক নাটক ও প্রহসন রচনার সূত্র ধরে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হোক বা মৌলিক হোক, সামাজিক নাটক ও প্রহসন রচনার দৃষ্টান্ত আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অসমীয়া ভাষায় লেখা গুনাভীরাম বরুয়ার ‘রামনবমী’ (১৮৫৭), হেম বরুয়ার ‘কানীয়ার কীর্তন’ (১৮৬১), রুদ্ররাম বরদলৈর ‘বঙাল বঙালী’ (১৮৭২), ওড়িয়া ভাষায় লেখা রঘুনাথ পরিছার’র ‘গোপীনাথ বল্লভ’, (১৮৬৮), জগমোহন লালার ‘বাবাজী’ (১৮৭৭), তবে বলা হয়, ‘বাবাজী’ ওড়িয়া নাট্যসাহিত্যের প্রথম সামাজিক নাটক, যার মধ্যে আধুনিক ওড়িয়া নাট্যগুন সমৃদ্ধ ছিল। কন্নড় ভাষায় লেখা বসবন্না শাস্ত্রীর ‘শূরসেন চরিত’ (১৮৯৫), কর্কি ভেঙ্কটরমন শাস্ত্রীর ‘ইজ্ঞপ্পা হেজ্ঞডেয় বিবাহ প্রহসন’ (১৮৮৭), যা প্রথম এই ভাষার সামাজিক এবং মৌলিক নাটক। বেনাগল রামা রাও এর ‘কলহ প্রিয়া প্রহসন’ (১৮৯৮)। গুজরাতি ভাষায় লেখা দলপতরামের ‘লক্ষী’ (১৮৫১), এবং এই ভাষার প্রথম সামাজিক এবং মৌলিক নাটক নগীনদাস তুলসীরাম সরফতিয়ার ‘গুলাব’ (১৮৬২)। হিন্দি ভাষায় লেখা ভারতেন্দু হরিশচন্দ্রের ‘রত্নাবলী’, ‘পাখন্ড বিড়ম্বন’ (১৮৭২), তাঁর প্রথম মৌলিক নাটক এবং যাকে উচ্চমার্গের প্রহসন বলা যায় ‘বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি’ (১৮৭৩)। মারাঠি ভাষায় লেখা গোবিন্দ নারায়ন মাডগাঁওকরের ‘ব্যবহারোপযোগীনাটক’ (১৮৫৭), ‘ভোজনবন্ধু পানতাংওয়াখু’ (১৮৬০) প্রভৃতি। বলা হয় মারাঠি সামাজিক নাটকের প্রস্তুতি পর্বে সামাজের দুর্দশা ও তার পরিণাম দেখানোই ছিল এ নাটক গুলির মূল উদ্দেশ্য।

উল্লেখিত নাটকগুলি আসলেই ভারতীয় ভাষায় রচিত নাট্য রচনা প্রথম প্রয়াসের রূপরেখা বলা যেতে পারে। তবে ঐ শতাব্দীতে রচিত নাটকগুলির বিষয় ছিল সমাজ কেন্দ্রিক ও সমাজের বহুমুখী সমস্যা কেন্দ্রিক। সামাজিক প্রথার দোষ ও অসঙ্গতি থেকে শুরু করে, বাল্যবিবাহ এবং সমাজের উচ্চ ব্যক্তিদের পদস্খলন যেমন নাট্যকারেরা সুচারুভাবে বর্ণনা করেছেন, তেমনি তৎসময়ে ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে পানদোষের প্রবল প্রবণতাকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা রূপে অবতরণ করেছেন। এ সমস্যা মূলত প্রথম দিকে রচিত নাটক বা প্রহসন গুলিতেই দেখা যায়। যেমন বাংলায় মধুসূদন দত্তের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’, অসমীয়ায় হেম বরুয়ার ‘কানীয়ার কীর্তন’, মারাঠিতে মাডগাঁওকরের ‘ভোজনবন্ধু পানতাংওয়াখু’, ওড়িয়াতে ‘বাবাজী’, ইত্যাদি নাটক ও প্রহসন গুলিকে বিশেষভাবে নির্দেশ করা যায়। এই প্রবন্ধের আশু উদ্দেশ্য মধুসূদন দত্তের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ (১৮৬০) এবং জগমোহন লালার ‘বাবাজী’ (১৮৭৭) নাট্যদ্বয়ের মধ্যে নব্য ইংরেজি শিক্ষিত বাবু সমাজ এবং জমিদার শ্রেণির পানদোষ সমাজকে কতটা অবক্ষয় ও কু-অভ্যাসে পরিণত করেছে, তা তির্যক ভাবনায় আলোকপাত করা। এই তির্যক ভাবনায় শুধু সাদৃশ্যই নয়, বৈসাদৃশ্যের ভাবনায় সমাজের উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত দেখানোর একটা প্রয়াসও থাকবে।

প্রথমে আসা যাক ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ নাটকটিতে, যেখানে দুই অংকে দুটি দুটি মোট চারটি গর্ভাঙ্কে তৎকালীন নব্য ইংরেজি-শিক্ষিত বাবু সমাজের বিদেশি আনায় ভরপুর করে তোলার যে প্রাণপণ চেষ্টা এবং সাথে সাথে সমাজের যুব সম্প্রদায়কে অধোগমনের দিকে ঠেলে দেওয়ার চিত্রটি লেখক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আশ্রয়ে তা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সমাজকে সচেতন করেছেন। অন্যদিকে ‘বাবাজি’ নাটকে মোট চার অংকের মধ্যে পাশ্চাত্য আদব-কায়দাকে অনুসরণ করতে গিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত নয়, অথচ বাবু, সেই বাবু সমাজ পানদোষকে নিজেদের স্বভাব সিদ্ধ করে তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত। এছাড়া সমাজের কুসংস্কার, ধর্মভন্ডামি, ব্যভিচারিতার মতো নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় নাটকটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

‘একেই কি বলে সভ্যতা’ নাটকটিতে দেখা যায় মদ্যপান আসলে কলকাতার ধনী অভিজাত পরিবারের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের কাছে সামাজিক সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠার এক অনন্য উপাদান। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, নাটকে বর্ণিত নবকুমার ও কালীনাথের মতো নব্য বাবুদের কথা। তাদের কাছে মদ যেন অমৃত। তা প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নববাবু ও কালিনাথ এর কথোপকথনে স্পষ্ট, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 332
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"কালী। কি উৎপাত! তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা একেবারে যেন
শুকিয়ে উঠলো। ওহে নব, বলি কিছু আছে?
নব। হষ! অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না, বোধ করি ব্রান্ডি আছে।"[১]

নবকুমারের নির্দেশে বোতল এবং গ্লাস এনে দেওয়ার পর কালীনাথের মধ্যে মদ্যপানের আসক্তি তীব্র হয়ে ওঠে। নবকুমারের নিষেধকে তোয়াক্কা না করে বোতল হাতে নিয়ে বলতে থাকে, -

"রসো ভাই, আরো একটু খেয়ে নি। দেখ, যে গুড জেনেরেল হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে প্রোবিজন জমাতে কশুর করে।"[২]

এবং নবকুমার কালীনাথের মুখের গন্ধ চাপা দেওয়ার জন্য তাঁরই আদেশে বাড়ির চাকর বৈদ্যনাথ যখন কয়েকটা পান এনেদিল, সেই পান দেখে কালীনাথ বলতে থাকে, -

"আমি ভাই পান তো খেতে চাই নে, আমি পান কত্তে চাই।"[৩]

এখানে 'পান' শব্দ দুটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা ঐ সমাজের প্রকৃত অবস্থান সুস্পষ্ট হয়েছে।

শুধুই মদ আর মদ, যা তৎসময়ে যুবসমাজকে আপাদমস্তক গ্রাস করেছে। ঠিক আবার অন্যদিকে, জগমোহন লালার 'বাবাজি' নাটকে বাবু সুবল পট্টনায়ক ঐ শ্রেণিভুক্ত। অভুক্ত, ধর্মপ্রাণ, ধর্মরক্ষক বাবাজী যখন তাঁর গৃহে এক মুঠো অন্নের জন্য স্থিত হয়, তখন তিনি খাবারের আয়োজন নিশ্চিত না করে, নিজের মদের আয়োজন নিশ্চিত করে, মদের আসক্তিতে ডুবে যায়। প্রথম অংকের শেষে দেখা যায় বাবাজীর ভজন গানের তাল দেওয়ার জন্য পট্টনায়ক বাবুর বন্ধু জসু বাবুর উপস্থিতি। তাঁর মতে মদ না খেলে গানের তাল দেওয়া যায় না। আমোদও আসে না। তাই বেদানার সরবৎ নামে দু-ডোজ মদ খেয়ে বাবাজীর ভজন গানে তাল দিতে থাকে। কারণ বেশি খেলে তালের ছন্দ কেটে যাবে। তাই বোতলের অবশিষ্ট মদটুকু বাবু পট্টনায়ককে শেষ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, -

"তার মানে বোতলটা কি আমায় একাই খালি করতে হবে? পেটটা ফেঁপেছে। কি করি বলুন তো?"[৪]

এই জিজ্ঞাসায় জসু বাবুর সৎ উপদেশ নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করার মতো, -

"এই সরবৎ বেশি করে খান, এখনই পেট ভালো হয়ে যাবে।
বাবু : বলছেন, ভালো হয়ে যাবে? তবে খাই।"[৫]

এরা ইংরেজি-শিক্ষিত বাবু নয়, আসলে এই বাবু সমাজ পাশ্চাত্য আদব-কায়দাকে অনুসরণ করে বাবু হয়ে উঠেছে। যাদের কাছে শিক্ষা নয়, সমাজ নয়, মদের নেশায় ডুবে যাওয়াটাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে যে বাবুদের কথা আছে, তারা শুধুই মদের নেশায় ক্ষান্ত নয়, নারীসঙ্গ নিয়ে তারা এই নেশাকে আরো বেশি তীব্র করে তুলেছিলেন। যা নাটকের পর্বে পর্বে বর্ণিত হয়েছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে মদ এবং নারীই নয়, এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গাঁজাও। আর এই তিনটিকে একত্রে এক ছাতার নীচে আনার জন্য ঐ কালের নব্য বাবুদের নিজস্ব সভা জ্ঞানতরঙ্গিনীর প্রতিষ্ঠা। যার আভিধানিক অর্থ 'জ্ঞান' অর্থাৎ বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য। আর 'তরঙ্গিনী' অর্থাৎ যা নদীর মতো বা স্রোতস্বিনীর মতো প্রবাহিত। এ সভার সদস্য নব্যবাবু সম্প্রদায়, - চৈতন্য, বলাই, শিবু, মহেশ, নবকুমার এবং কালীনাথের মতো প্রমুখ ব্যক্তিগণ। যাদের কাছে শাস্ত্রজ্ঞান তো দূরের কথা, ব্র্যান্ডি এবং বিয়ারের মতো পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে বারবিলাসিনীর সঙ্গটাই জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার আদি বা প্রধান জ্ঞান চর্চার বিষয়। তবে সভার অন্যতম এবং প্রধান সদস্য নবকুমারের মুখে একেবারে সেকালের মেকি জ্ঞানচর্চার কথা শোনা যায়। সে অন্যান্য সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, -

"জেন্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যা বলে সুপারস্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি, আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতি দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েছে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।"[৬]

আবার নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা নিয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায় -

> "জেন্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর -- তাদের স্বাধীনতা দেও - জাতভেদ তফাৎ কর - আর বিধবাদের বিবাহ দেও - তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে - নচেৎ নয়।"[৭]

পুনরায় ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে সে বলে –

> "কিন্তু জেন্টলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহকে কেবল আমাদের লিবরটি হল অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান এখানে যার যে খুশি, সেটাই কর। ..., লেট অস এঞ্জয় আওর সেলভেস।"[৮]

জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা এই পাশ্চাত্য শিক্ষিত নব্য বাবুদের বহিরাবরণের একটা মোড়ক মাত্র। আসলেই তাঁদের অন্তরের অতৃপ্ত বাসনা হল, এ সভার অন্তরালে মদে আসক্ত হয়ে বারাঙ্গনা নিয়ে ফুর্তি করা। যা সম্পূর্ণটাই ঘটেছে সমাজ ও সংসারের আড়ালে। নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা, জাতপাত প্রভৃতি জ্ঞানের কথা শুধুই মুখে বলতেই শোনা গেছে। বাকীটা? তাই তো নাটকে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার কর্ণধার নবকুমারকে বলতে দেখা যায়, -

> "ও পায়োধরি, তোমরা একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক।"[৯]

সেই একিই সুরে গলা মেলাতে দেখা যায় সতীর্থ কালীনাথকে, -

> "ও নিতম্বিনি, তুমি ভাই, আমাকে ফেভর কর। আহা! কি সফট হাত!"[১০]

অন্যদিকে, জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার মতো 'বাবাজী' নাটকে মঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় মতে মঠ ভারতীয় সনাতন ধর্মের একমাত্র প্রসার কেন্দ্র, এবং ধর্মচর্চার প্রাণ কেন্দ্রও বটে। কিন্তু কথায় বল, যে রক্ষক সেই ভক্ষক। কারণ নাটকে দেখা যায়, ধর্মের কথা তো দূরে থাক, অশাস্ত্রীয় কার্যকলাপ, ভন্ডামি, ব্যভিচারিতার মতো নিকৃষ্টতম কর্মের উদাহরণের সাক্ষী ঐ মঠ। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার মতো এটাও লোক দেখানো মোড়ক মাত্র। শুধুই মুখে মুখে গৌরাঙ্গ হে, গৌরাঙ্গ হে, কৃষ্ণঃ! কৃষ্ণঃ! কৃষ্ণঃ! হরে হরে, আর অন্তরে আছে পরকীয়া প্রেমের তীব্র অনুভূতি। নাটকে অধিকারী চরিত্রটির নামে মাত্র হাতের ঝোলা, গায়ে নামাবলী, কপালে তিলক কাটে। কিন্তু মনে আছে মালতির প্রতি প্রেম। সে যতক্ষণ না ধর্মের কথা ভাবে, তার চেয়ে বেশি ভাবে মালতিকে নিয়ে। তাইতো অধিকারী লোক দেখানো ধার্মিক হয়েও একজন সৎ ধার্মিক বাবাজীকে ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা না করে, মালতিকে জোর করেই ভোগের প্রসাদ দিতে দেখা যায়। যা উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তিতে স্পষ্ট, -

> "মালতি : প্রসাদ দাও। বাড়ি নিয়ে যাব। এখন খাব না।
> অধিকারী : কেন খাবি না? সত্যি বল, আমার দিব্যি।
> মালতি : আমি আজ দুটো পিঠে খেয়েছি। পরে প্রসাদ খাব।
> অধিকারী : একটু কিছু খেয়ে নে, আর। মা'র জন্য নিয়ে যা, আমার দিব্যি কিছু খেয়ে নে।"[১১]

এখানে মালতির গরজ যতটা না, তার চেয়ে বেশি গরজ অধিকারীর। কারণ তার দেরি, আর না খাওয়া অধিকারী সইতে পারে না। যার জন্য অধিকারীর এই ত্যাগ বা চিন্তা। আবার সেই মালতি মঠের মহন্ত মহাশয়ের পা ডলে দিয়ে একটি সাতশো টাকার শাড়ি পেয়েছে। দু'ই ধার্মিক মালতির মহিমায় মজেছে। কিন্তু নিরন্নের প্রতি তাদের কোনো দয়া নেই, মায়া নেই। অধিকারী মালতির প্রতি যতটা সচেতন, অন্যদিকে অভুক্ত বাবাজীর প্রতি ততটাই অসচেতন হয়ে তাঁর উদ্দেশ্য করে বীরসিংহ কে বলতে শোনা যায়, -

> "তুই বাবাজিকে বলে দিবি খাওয়া-দাওয়া পাওয়া যাবে না। গৌরাঙ্গ হে!"[১২]

আবার ঐ মঠে জামূনী নামে এক বোষ্টমীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যার মুখে হরে হরে, কিন্তু অন্তরে আছে অধিকারী এবং মঠ মহন্ত। সে না কি প্রেম ছাড়া কিছুই বোঝেনা। যা তার কথাতেই স্পষ্টই। মঠে বাবাজীকে দেখে সে বলে, -

> "লোকটা মুখটা শুকনো করে বসে আছে। ওর মুখে কোনো প্রেমভাব নেই।"[১৩]

আসলে এদের কাছে শাস্ত্র নয়, ধর্মই নয়, পরকীয়াই সব। আর তৎসময়ে এই মঠ হয়ে উঠেছিল অসৎ, ভেকধারী সাধু, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের পরকীয়ার আঁতুর ঘর।

এতো গেল পরকীয়ার বিষয়। 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকের মতো এখানেও বারাঙ্গনাদের আনাগোনা প্রত্যক্ষ করা যায়। পয়োধরী, নিতম্বিনির রূপে জেমী ও রাধী আছে। বাবাজী তাদের পরিচয় জানতে চাইলে জেমী বলে, -

> "আমরা সঙ্গীতের ব্যবসা করি।"[১৪]

এ প্রসঙ্গে 'বাবাজী' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক শিবুর কথায় জানা যায়, -

> "আমরা সব বন্ধুও রাধীকে আনব। সে আজকাল। ভালই গাইছে। বেশ মজা হবে।"[১৫]

এই একিই প্রসঙ্গ টেনে শিবুর অপর বন্ধু খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী জেমসের কথায়, -

> "যা মজা হবে, দেখা যাবে। এখন বল কি হবে। তবে হ্যাঁ, জায়গাটা মৌজের জায়গা বটে। রাধী ও জেমী দু'জনকেই আনব। একজনে জমবে না। দেশি সুরা আর ব্র্যান্ডি দুরকমই আনতে হবে, ওসব না হলে জমবে না।"[১৬]

'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে মদ, ও নারীতে যে সুর তা 'বাবাজী' নাটকেও প্রত্যক্ষ ভাবেই লক্ষ করা যায়। এখানে দেশি, বিদেশীর সঙ্গে নারী নৃত্যের ঝংকার মিলে মিশে একাকার। শিবুর উক্তিতে তা ধরা পড়ে, -

> "তা না হলে কি হবে। সুরা ও স্ত্রীলোক সংসারের সার। ওয়াইন অ্যান্ড ওয়্যান আর দি টু থিংকস ইন দি ওয়ার্ল্ড। আরে জেমী আর রাধীর গান গাওয়ার কথা ছিল। এখানে আসব, তাই বারণ করে দিয়েছি।"[১৭]

হয়তো এদের নবকুমার ও কালীনাথের জ্ঞানতরঙ্গিনীর মতো স্থায়ী কোনো আস্থানা নেই। তবে তারা যে জায়গাকে ভালো সুন্দর বলে মনে করে সেখানে তারা মদ ও নারী নিয়েই আনন্দ ভাগ করে নেয়।

'বাবাজী' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে নাট্যকার 'বাবাজী নামে' একটি করে চরিত্রের উল্লেখ করেছেন। যারা উভয়ই সৎ ও ধার্মিক। যাদের চোখ দিয়ে দুই নাটকার ঐ সময়ে সমাজের ভন্ডামি এবং ব্যভিচারিতার নানান দৃষ্টান্ত নাটক দ্বয়ের পর্বে পর্বে অঙ্কিত করেছেন। প্রথমে, 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে দেখা যায়, জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা নবকুমার এবং কালীনাথের মতো নব্য বাবুরা। নামে মাত্র জ্ঞানতরঙ্গিনী, যেখানে জ্ঞান নয়, মদ ও নারীর সংস্পর্শে চলে আনন্দের জোয়ার। বাড়িতে কর্তা মশায় অর্থাৎ নবকুমারের বাবা উপস্থিত থাকায় সেদিনের আনন্দ হয়তো মাটি হয়ে যাবে। সেই আশংঙ্কায় বা ভাবনায় নানা ছলনার আশ্রয় নবকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কালীনাথ জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার গুরুত্ব সম্পর্কে কর্তা কে বলেন, -

> "আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরেজি চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃত বিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম শাস্ত্রের আন্দোলন করি।"[১৮]

এছাড়া কালীনাথ এও বলে, তারা 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থ গুলি সংস্কৃত পণ্ডিত কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়ের সঙ্গে ব্যাখ্যা ও আলোচনা হয়। এদের কথাবার্তা এবং চালচলনে অসংগতি লক্ষ্য করায় কর্তামশায় বাবাজীকে নবকুমারের পিছু নিতে পাঠায় এবং প্রকৃত ঘটনা কি তা বাবাজীর মাধ্যমে জানতে চাই। সিকদার পাড়ার গলিতে ঐ জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার খোঁজ করতে গিয়ে বাবাজী বিচিত্র ঘটনার সন্ধান পায়। এক মাতাল, যাকে বলতে শোনা যায়, -

> "তবে, শালা, তুই এখানে কচ্চিস কি? হাঃ শালা।"[১৯]

এরপর সে দেখতে পায় দুই বারবিলাসিনীকে। তাদের দেখে বাবাজীর মনে যে ভাবনার উদয় হয়,

> "এ আবার কি? (অবলোকন করিয়া) আহাহা, স্ত্রীলোক দুটি যে দেখতে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এঁরা কে হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।"[২০]

মুখে হরেকৃষ্ণ, কিন্তু তার মনে কোথাও নারীর প্রতি যে দুর্বলতা তা পাঠকের চোখে ধরা পড়ে। মনের এই অতৃপ্ত বাসনার মধ্যে তাকে পড়তে হয় ঘুষখোর ইংরেজ সার্জেনের হাতে। এভাবেই নানা বাঁধা অতিক্রম করে অবশেষে বাবাজী পৌঁছায় নব্যবাবুদের তৈরি বিখ্যাত মাতাল সভা অর্থাৎ জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা মধ্যস্থলে। সভার আড়ম্বর দেখে বাবাজী বলেন, -

> "(স্বাগত) কি সর্বনাশ, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা।"[২১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 332
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিছুক্ষণ সেখানে স্থিত হওয়ার পর বাবাজী ধীরে ধীরে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার মহিমা বুঝতে পারে। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, -

> "(অগ্রসর হইয়া স্বগত) একি চমৎকার ব্যাপার? এরা তো কশবী দেখতে পাচ্ছি। কি সর্বনাশ! আমি এতক্ষনে বুঝতে পারছি কান্ডটা কি। নবকুমার কে দেখছি একবারে বয়ে গেছে। কর্তা মশায় এসব কথা শুনলে কি আর রক্ষে থাকবে?"[২২]

আবার ওখানে বাবাজীর উপস্থিতি দেখে নবকুমারের মাথায় হাত। সে বাবাজীকে উদ্দেশ্যে কালীনাথকে বলতে শোনা যায়, -

> "আজ ভাই দেখছি এই বাবাজী বেটা একটা ভারী হেঙ্গাম করে বসবে। এখন বোধ করি, ও ঐ মাগিদের ভিতর ঢুকতে দেখেছে।"[২৩]

অন্যদিকে 'বাবাজী' নাটকে বাবাজী চরিত্রটির ভূমিকা সর্বাগ্রে বলা যায়। কারণ তাঁর ধর্মপ্রাণ হৃদয়, মনুষত্ব, মানবিকতা সর্বোপরি তাঁর নির্লোভতা ও ধৈর্য্য যার সবচেয়ে বড় পরিচয়। যাকে ভন্ডামি, ব্যভিচারী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং কুপথে চালিত মানুষগুলিকে সঠিক পথ দিয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে দেখা যায়। এর জন্য তাঁকে অপমান এবং সাধারণ মানুষের তিরস্কার অবলীলায় সহ্য করতে হয়েছে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায় বাবু সুবল পট্টনায়ক বাবাজীর জন্য খাবার ব্যবস্থা করতে বললেও রান্নি পূজারী অসৎ ও দুষ্টতার আশ্রয়ে সন্ন্যাসীকে খাবার থেকে বঞ্চিত করতে চাই। সঙ্গী রামা পূজারীকে বাধা দিয়ে বলেন, -

> "এ বৈষ্ণব খেতে এসেছে। খেতে না দিলে অভিশাপ পড়বে।"[২৪]

কিন্তু পূজারী এতটাই ক্রূরচিত্ত যে বামার কথার উত্তরে তার প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়, -

> "আরে হ্যাঁ, এরকম বাবাজী অনেক দেখেছি। কত বাবাজীকে জব্দ করেছি। ব্রাহ্মণের ওপর বৈষ্ণবের অভিশাপ আবার কি পড়ে! সে যে আমার ঘুম নষ্ট করল। আমার অভিশাপ তার ওপর পরবে না? দাঁড়াও, একটু মজা করি।"[২৫]

সত্যি সত্যি ক্ষুধার্ত বাবাজীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাকে খেতে বসিয়ে শুধু ভাতের সঙ্গে শুটকি মাছ, আবার কখনো মাংস খাওয়ার কথা পূজারী জিজ্ঞাসা করে। কিছুক্ষণ পর আস্ত মুরগি হাঁড়ির ভিতরে করে বাবাজীকে খেতে দেয়, এবং বিদ্রুপ করে বলা হয়, -

> "আপনি মুরগি খাবেন বলেছিলেন। তাই একটা আস্ত মুরগি রোস্টকাবাব করে এনেছিলাম। কিন্তু আপনি এতই পুণ্যবান যে আপনার হাতের স্পর্শে সে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আমার কি দোষ! মহারাজ, আপনার অপার মহিমা! মুরগি মেরে রান্না করলাম, সে প্রাণ ফিরে পেল, এমন তো কখনও দেখিনি।"[২৬]

এমন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর পূজারীর আচরণে অভুক্ত বাবাজী কষ্ট পেলেও তাঁর আচরণে কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। বরং পূজারী বাবুকে একথা না বলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে মানবিক করে তোলার জন্য কিছু উপদেশ দেন, -

> "যারা মূর্খ তার দোষ না লুকিয়ে বাজারে নিন্দে করে। আমি বাবুকে বুঝিয়ে বলে দেব। পূজারী এরকম দুষ্কর্ম আর করবে না। ওহে পূজারী, ক্ষুধার্তকে কষ্ট দেওয়া, মনিবের নিন্দা করা, মিথ্যা কথা বলা এসব পাপ। এজন্য পরকালে দন্ড পেতে হয়। এরকম কুকাজ আর করবে না। - মিথ্যা ভাষনং ন কর্তব্যং! প্রতিজ্ঞা কর যে মিথ্যা বলবে না। - এ প্রতিজ্ঞা পালন না করলে তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে পারবে না।"[২৭]

বাবাজীর উপদেশে নিষ্ঠুর পূজারী, নিজের ভুল বুঝতে পেরে, নিজেকে সুদরে নিয়ে বলতে শোনা যায়, -

> "আমি বড় দুষ্কর্ম করেছি। কী দুর্বুদ্ধি হল আমার খারাপ লাগছে। আমি চন্ডাল! আমার ভালোবাসা নেই।"[২৮]

অনুরূপ ভাবে বলা যায়, জেমী ও রাধীর কথা। যাদের মধ্যে কুসংস্কার, ভুত-প্রেত এবং নানান ওঝার তন্ত্রবিদ্যার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বাবাজীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ এবং এগুলির প্রতি তাঁর যুক্তির পারম্পর্যতায় জেমী ও রাধীর

ভ্রম কেটে যায়। এ বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসায় তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন হয়। তাই নাটকে জেমীকে বলতে শোনা যায়, -

"না, পারে না। এবার আমি বুঝলাম, মহারাজ। আমাদের মতো অবোধ লোকেদের সাধুরা এইভাবে ঠকায়।"[২৯]

জেমী ও রাধীর মতো নানান কুসংস্কারে বিশ্বাস করে শিব ও জেমস। কিন্তু বাবাজী সেই যুক্তির পথ দিয়ে তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেমনটা অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিরা করে থাকেন। বাবাজী যে কতটা সত্য তা জেমসের বক্তব্যে বোঝা যায়, -

> "এ বাবাজী আমাদের পাদ্রী সাহেবের মতো বোঝাল। কুসংস্কার বিষয়ে সাহেব যা বলেন সব সত্যি।"[৩০]

অবশেষে বলা যায়, সেই ধূর্ত, প্রতারক, ঠকবাজ রান্নি পূজারীর কথায়, যে কি না বাবাজীর উপদেশে কিছুটা হলেও সুদরেছে। কিন্তু মনে কোথাও সেই প্রতারণা ও ঠকবাজ বৃত্তিটা থেকে গেছে। ভূত-প্রেত, পেটে নোখ বা গাছের শিকড় পড়া, গারডী বা বিষ বৈদ্য বিদ্যা, তন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি আশ্রয়ে পূজারী উপার্জন করত। এসব বিদ্যা বাবাজীকে শোনানোর পর তিনি এগুলি প্রকৃত কি? তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করায় পূজারী নিজের ভুল বুঝতে পারে। এবং পূজারীকে শুধু এ জন্মে নয়, পরজন্মে যাতে সুখলাভ হয়, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, -

> "যদি লাভ ও সুখের ইচ্ছা থাকে তা হলে এমন কর যাতে কেবল ইহকাল নয়, পরকালেও সুখলাভ হবে।"[৩১]

এই সূত্র ধরে পূজারীর কথায় জানা যায়, -

> "হ্যাঁ, ঠিক কথা, এবার তাই করব। আপনার কাছে অনেক কিছু শিখলাম।"[৩২]

অর্থাৎ বাবাজীর হাত ধরে নাট্যকার সমাজের ভন্ডমি, ব্যভিচারিতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ এবং ঠক প্রতারকদের সঠিক পথে আনার প্রয়াশ দেখিয়েছেন। এ বাবাজী এখানে স্বয়ং স্বক্রিয়। কিন্তু 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বাবাজী এখানে নিস্ক্রিয় বলা সঙ্গত।

তবে 'বাবাজী' নাটকের বাবাজীর সঙ্গে 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে নবকুমারের বাবা অর্থাৎ কর্তা মশায়ের সঙ্গে সাদৃশ্য বর্তমান। কারণ তিনিও ধর্মপ্রাণ। বৈষ্ণব ধর্মকথা তাঁর শরীরে প্রবাহমান। তাই তো নাটকে দেখা যায়, নবকুমারের বন্ধু কালীনাথ বৈষ্ণব ঁকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বলে মিথ্যা পরিচয় দেওয়ায়, না বুঝে তার প্রতি কর্তামশায়ের স্নেহ, ভালো এবং বিশ্বাস অনেক গুণ বেড়েছিল। যা তাঁর কথায় বোঝা যায়, -

> "(স্বাগত) আহা, ছেলেটি দেখতে শুনতেও যেমন, আর তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না?"[৩৩]

আবার কালীনাথের মুখে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'র কথা শোনায় তিনি বলেন, -

> "জয়দেব? আহা, কবিকুল- তিলক, ভক্তির -সাগর।"[৩৪]

তিনিও বাবাজীর মতো সকলের ভালো, সকলের মঙ্গল কামনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, -

> "আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্রি করো না।"[৩৫]

কিন্তু কার কথা কে শোনে। শাস্ত্র অধ্যয়নের নাম করে মদের আসরে বারাঙ্গনা নিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে। এবং সেখান থেকে মদে আসক্ত হয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে ধার্মিক বাবা সম্পর্কে নবকে বলতে শোনা যায়, -

> "(স্বগত) ড্যাম কর্ত্তা-- ওলড ফুল আর কদিন বাঁচবে আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কর্তে পারবো না। বুড়ো একবার চখ বুজলে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে?"[৩৬]

নবকুমারের এই মাতলামি বাড়ির অভ্যান্তরে জানাজানি হওয়ায় বাবা সেখানে উপস্থিত হয়ে নবকুমারের অবস্থা দেখে বুঝতে পারেন সে মদ খেয়েছে। তিনি মদ্যপ পুত্রের প্রতি যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তা প্রতিটি ভদ্রলোক ও ভদ্রসমাজের পক্ষে অনুকূল। তিনি বলেন, -

> "কি সর্বনাশ, রাধে কৃষ্ণ! হা দুরাচার! হা নরাধম! হা কুলাঙ্গার!"[৩৭]

এ প্রসঙ্গে তিনি স্ত্রীর মুখে সোনার চাঁদ কথাটি শোনার পর ব্যঙ্গমিশ্রিত তিক্ততায় বলেছেন, -

"(সরোষে) সোনার নব! হ্যাঁ! ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পারনি?"[৩৮]

সরল সাধারণ নবকুমারের মা'কে ছেলের অবস্থা বোঝানোর জন্য তাঁকে স্পষ্ট বলতে হয়, -

"তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে ও লক্ষীছাড়া মাতাল হয়েছে।"[৩৯]

ছেলের দুর্মতি হওয়ায় তিনি নব্য শিক্ষিত বাবুদের কলির রাজধানী অর্থাৎ এই কলকাতা মহাপাপ নগরে পরিণত হয়েছে। সেখানে তাঁর মতো ধার্মিক বৈষ্ণব থাকতে পারবে না। তাই তিনি ছেলের সুমতি ফেরানোর জন্য এ পাপ নগর ত্যাগ করে শ্রী বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। সার্বিকভাবে না হলেও আংশিক ভাবে তিনি বাবাজীর মতো পথভ্রষ্টকে পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

এবার আসা যাক, উভয় নাটককের গানে প্রসঙ্গে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুসারে নাট্য কথার অর্থ হল "নিত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বয়।"[৪০] তবে আলোচ্য নাট্যদ্বয়ে উক্ত বিষয়ে সমাগম লক্ষ্য করার মতো। 'বাবাজী' নাটকে ভক্তিমূলক ভজন গানের প্রসার দেখা যায়। এখানে মোট তিনটি গান গীত হয়েছে। প্রথম অংকে দুটি এবং চতুর্থ অংকের একটি। প্রথম দুটি গান বাবাজীর কণ্ঠে গীত। এবং অপর একটি গান বারাঙ্গনা ক্ষেমীর কণ্ঠে গীত। প্রতিটি গানের রাগ রাগিনী তাল সবই ভিন্ন ধরনের। তা এরূপ, -

গানের প্রথম লাইন	রাগ-রাগিনী	তাল
১। দীনবন্ধু দয়াল মোর কেহ নাহি।	ঝিঁঝিট	একতাল(বাবাজী)
২। পতিত পাবন... এ পাপীর তোমার পদ ধরি। ৩। বিশ্বপতি! কি দিয়ে পূজিব তোমার হে।	জংলা সিন্ধু	ঠুংরি (বাবাজী) আড় তাল ধামার (ক্ষেমী) বারাঙ্গনা

সবকটি গান ভক্তি ও শিক্ষামূলক। যা নির্দিষ্ট রাগ রাগিনী ও ছন্দে গীত। বাবাজী ভজনের মধ্য দিয়ে ঠক ও ব্যভিচারীদের সঠিক পথে চালনা করতে চেয়েছেন। এছাড়া নব্য যুবকদের মদের আসরে যে নাচ ও গানের প্রসঙ্গ আছে তা সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও তার সুরের যে মাত্রা তা যথাযথ ভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে দ্বিতীয় অংকের প্রথম গর্ভাঙ্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গানের কথা আছে। যা বারাঙ্গনা পয়োধরীর কণ্ঠে গীত। এখানেও বাবাজী নাটকের মতো রাগ-রাগিনী ও তালের উল্লেখ পাওয়া যায়, -

গানের প্রথম লাইন	রাগ-রাগিনী	তাল
এখন কি আর নাগর তোমার আমার প্রতি, তেমন আছে।	শঙ্করা	খেমটা পয়োধরী (বারাঙ্গনা)

এই গানটি মূলত ভক্তিমূলক নয়। তবেই মদের আসর জমানোর জন্য একেবারে রসালো। এ গানটি ছাড়াও জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাতে নব্যবাবুদের মদ্যাসক্তিতে অন্যান্য গানের প্রসঙ্গ এসেছে। এ গান বারাঙ্গনাদের নাচের তালে আনন্দ উপভোগ করবার জন্য গীত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 38
Website: https://tirj.org.in, Page No. 323 - 332
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সর্বোপরি বলা যায়, নাট্যদ্বয়ে নাট্যকারেরা সমাজে নব্য শিক্ষিত যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত যে অধোগমনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, এছাড়া ব্যভিচারিতা, ভন্ডামি এবং কুসংস্কারাচ্ছন্নতা তাঁদেরকে আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে আছে। যা থেকে উভয়ই সমাজকে পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এবং আজ আর বাবুসম্প্রদায় নেই। তবে বাবুসমাজের মতো পানদোষ, ব্যভিচারিতা এবং ভন্ডামি প্রভৃতি আজও সমাজে প্রবাহমান। ঐ বাবুসমাজ অনেকাংশে আজকের সমাজের পথপ্রদর্শক এবং যেন উত্তরসূরির দলিল হিসাবে চিহ্নিত।

Reference:

১. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, 'নির্বাচিত রচনা', সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১২৪
২. তদ্বেব, পৃ. ১২৫
৩. তদ্বেব, পৃ. ১২৫
৪. চক্রবর্তী, বিপ্লব, 'বাবাজী' (সম্পাদনা ও অনুবাদ), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭
৫. তদ্বেব, পৃ. ১৭
৬. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, "নির্বাচিত রচনা", সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৩৯
৭. তদ্বেব, পৃ. ১৪০
৮. তদ্বেব, পৃ. ১৪০
৯. তদ্বেব, পৃ. ১৩৯
১০. তদ্বেব, পৃ. ১৪০
১১. চক্রবর্তী, বিপ্লব, 'বাবাজী', (সম্পাদনা ও অনুবাদ), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪
১২. তদ্বেব, পৃ. ২৪
১৩. তদ্বেব, পৃ. ২৫
১৪. তদ্বেব, পৃ. ২৪
১৫. তদ্বেব, পৃ. ৩৬
১৬. তদ্বেব, পৃ. ৩৬
১৭. তদ্বেব, পৃ. ৩৬
১৮. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, 'নির্বাচিত রচনা', সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১২৮
১৯. তদ্বেব, পৃ. ১২৯
২০. তদ্বেব, পৃ. ১২৯
২১. তদ্বেব, পৃ. ১৩৩
২২. তদ্বেব, পৃ. ১৩৪
২৩. তদ্বেব, পৃ. ১৩৫
২৪. চক্রবর্তী, বিপ্লব, 'বাবাজী', (সম্পাদনা ও অনুবাদ), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯
২৫. তদ্বেব, পৃ. ১৯
২৬. তদ্বেব, পৃ. ২০
২৭. তদ্বেব, পৃ. ২১
২৮. তদ্বেব, পৃ. ২২
২৯. তদ্বেব, পৃ. ৩২
৩০. তদ্বেব, পৃ. ৪১
৩১. তদ্বেব, পৃ. ৪৮

৩২. তদ্বেব, পৃ. ৪৮
৩৩. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, ‘নির্বাচিত রচনা’, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১২৭
৩৪. তদ্বেব, পৃ. ১২৮
৩৫. তদ্বেব, পৃ. ১২৮
৩৬. তদ্বেব, পৃ. ১৪৪
৩৭. তদ্বেব, পৃ. ১৪৫
৩৮. তদ্বেব, পৃ. ১৪৫
৩৯. তদ্বেব, পৃ. ১৪৫
৪০. মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর, ‘নাট্যতত্ত্ব বিচার’, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৪

Bibliography:

দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, ‘নির্বাচিত রচনা’, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৭,
চক্রবর্তী, বিপ্লব, ‘বাবাজী’ (সম্পাদনা ও অনুবাদ), বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ,
মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর, ‘নাট্যতত্ত্ব বিচার’, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ,
সেন, সুকুমার, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (৩য় খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২১ বঙ্গাব্দ,
মিত্র, ড. দিলীপ, ‘আধুনিক ভারতীয় নাটক’, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫
চক্রবর্তী, বিপ্লব, ‘মারাঠি সাহিত্যের ইতিহাস’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১১